পাঁচুমামার বিয়ে

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি)

বাবা যখন মারা গেলেন, তখন দাদার বয়স উনিশ, আমার সতেরো। অবস্থা আমাদের ছিল দিব্যি সচ্ছল, বড় বড় পাঁচ গোলা ধান তখন বাড়িতে, এক একটা গোলায় দু পৌটি আড়াই পৌটি ধান মজুত। জমিজমার আয়ও বার্ষিক হাজার দুই টাকার কম নয়, এ বাদে ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা ও মায়ের গায়ে সোনার গহনাও বেশ ছিল। আর ছিল গ্রামের মধ্যে প্রচুর মান, খাতির, রবরবা নাম-ডাক।

রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় লোয়ার প্রাইমারি পড়বার সময় ইতিহাসে পড়েছিলাম, কে একজন বাংলার সুলতানের পুত্র "পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন তাঁহার রাজকোষে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, তিন লক্ষ হস্তী, পাঁচ লক্ষ অশ্ব, দশ লক্ষ পদাতিক ও বিশ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য আছে" ...অতএব তাঁর মাথা ঘুরে গেল এবং তিনি দিল্লির সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে বসলেন। আমাদেরও হলো তেমনি অবস্থা।

মা ছিলেন নিরীহ ভাল মানুষ, ঠাকুরমা পিতৃহীন নাতিদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ, সুতরাং আমাদের মাথার ওপর কড়া শাসন করবার বা রাশ টেনে ধরবার তো কেউ ছিল না—এ অবস্থায় আমাদের মুণ্ড ঘুরে যাবে, এ আর বিচিত্র কি?

দাদাই অগ্রজের অধিকারে পথ দেখালেন প্রথম। আগে মুণ্ড ঘুরে গেল তাঁরই।

সে ইতিহাস রীতিমত বিচিত্র।

কাঁচরাপাড়ার কাছে বন্দিপুর গ্রামে আমার এক দূর সম্পর্কের মামা থাকতেন, তাঁকে পাঁচুমামা বলে আমরা ডাকতুম। বাবা বেঁচে থাকতে তিনি দু-একবার আমাদের বাড়ি যাতায়াত করেছিলেন বটে, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে তাঁর যাতায়াত, বিশেষ করে দাদার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল।

পাঁচুমামা দাদার চেয়েও চার-পাঁচ বছরের বড়। কাজেই আমি পাঁচুমামাকে খুব সমীহ করে চলতুম। পাঁচুমামাও আমার চেয়ে দাদার সঙ্গে বেশি করে মিশতো। একবার পাঁচুমামা এসে দাদাকে সঙ্গে করে বন্দিপুর নিয়ে গেল।

বন্দিপুর থেকে দিন পনেরো পরে ফিরে এসে দাদা ঠাকুরমাকে বল্লেন, ঠাক্‌মা, আমার দুশো টাকা বড় দরকার এখুনি। কলাই মুগের ব্যবসা করছি, পাঁচুমামা সস্তায় মাল বাঁধাই করছে, চাষাদের দিতে হবে—টাকাটা এখুনি চাই। মোটা লাভ হবে দু'মাস পরে। ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা কত ছিল তা আমার জানা ছিল না, তবে নগদ টাকা যে মন্দ ছিল না—এটা দাদাও জানতেন, আমিও জানতাম। ঠাকুরমা টাকাটা দিয়ে দিলেন, দাদা টাকা নিয়ে মাল খরিদ করতে চলে গেলেন।

দিন কুড়ি পরে পাঁচুমামাকে সঙ্গে নিয়ে দাদা আবার এসে শ'দুই টাকা চাইলেন। মাল যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে সস্তায়। পাঁচুমামার বাড়ি মাল গোলাজাত করা হচ্ছে, টাকারদরকার সেজন্যেই।

পাঁচুমামাও দাদার কথা সমর্থন করলেন। মাল সস্তার মুখে বেশি পরিমাণে খরিদ করে রাখতে পারলেই লাভ। টাকাটার দরকার বটে।

ঠাকুরমা জিগ্যেস করলেন—কত মাল কেনা হলো?

পাঁচুমামা বল্লে—তা দুশো মণের ওপর। এই টাকাটা পেলে আরও দুশো মণ খরিদ করা হবে। মণ পিছু আট আনা করে ধরলেও দুশো টাকা লাভ।

দিলেন টাকা ঠাকুরমা।

দাদা ও পাঁচুমামা টাকা নিয়ে চলে গেল—এরপরে মাসখানেক তাদের আর কোনো পাত্তা রইল না। ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে একখানা চিঠিও লেখালেন—তারও উত্তর এল না।

চিঠির উত্তরের বদলে আরও দিন দশেক পরে এলেন পাঁচুমামার এক ভগ্নিপতি নারাণবাবু। নারাণবাবু বৃদ্ধ ব্যক্তি, বন্দিপুরে তাঁরও বাড়ি। আমি তাঁকে কখনও আমাদের বাড়ি আসতে দেখিনি।

নারাণবাবুকে হঠাৎ আসতে দেখে বাড়িসুদ্ধ সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। দাদা ভাল আছেন তো? ব্যাপার কি?

নারাণবাবু হাত-পা ধুয়ে সুস্থ ঠাণ্ডা হয়ে ঠাকুরমাকে বল্লেন—মা, আপনি পটলকে কত টাকা দিয়েছেন এ পর্যন্ত?”

—চারশো টাকা।

নারাণবাবু অবাক হয়ে বল্লেন—এত টাকা কেন দিলেন? কি বলে টাকা নিয়েছিল আপনার কাছ থেকে?

ঠাকুরমা বল্লেন—কেন বলো তো বাবা এসব কথা জিগ্যেস করছো? সে তো মুগ কলাই-এর ব্যবসা করবে বলে টাকা নিয়েছে। কেন, পাঁচুও তো সেবার এসে ওই কথাই বলে গেল।

নারাণবাবু রাগে জ্বলে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন—পাজী বদমাইস্, ছুঁচো!...সেই রাস্কেলটাই তো যত নষ্টের গোড়া। অত বড় বদমাইশ কি আর আছে নাকি? সেই তো পটলটাকে ভালমানুষ পেয়ে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। ওই জন্যেই আমার সামনে বেরোয় না। ব্যবসা না মুণ্ডু। টাকা নিয়ে দুলে-পাড়ায় রাজি দুলেনী বলে এক মাগী আছে, তারই ওখানে দুজনে যাতায়াত করে—এর মধ্যে বোধ হয় সব টাকাই তার পাদপদ্মে ঢেলেছে। ব্যবসা!

মা আর ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দাদা যে এমন ব্যাপার করতে পারে এ সবারই ধারণার অতীত।

নারাণবাবু বল্লেন—আমিই কি আগে ছাই জানতাম! জানলে এমনতরো হয়? আমার সামনে তো দুজনের কেউ-ই বড় একটা আসে না, পরস্পরে শুনলাম এই ব্যাপার চলছে। শুনলাম খুব টাকা ওড়াচ্ছে। জোড়া জোড়া শাড়ি আসছে রাণাঘাটের বাজার থেকে মাগীর জন্যে। আজ খাবার, কাল খাগড়াই বাসন। বোধ হয় মদওধরেছে। তাই ভাবলাম আপনাকে একবার কথাটা জিগ্যেস করা দরকার যে, আপনি টাকা দিয়েছেন কিনা। তাই আজ এলুম।

ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবার বহুকষ্টে উপার্জন করা পয়সা—ছেলেরা সব মূর্খ ও নাবালক—যা কিছু আছে, সংসারের অসময়ে কাজে লাগবে বলেই আছে। এখনও আমার দুই বোনের বিয়ে দিতে বাকি। এ অবস্থায় বিধবার পুঁজি সামান্য টাকার মধ্যে চারশো টাকা এক দুলে মাগীর পেছনে এভাবে ওড়ানো!

সমস্ত রাত পরামর্শ করার পরে ধার্য হলো যে, পরদিন সকালে নারাণবাবু আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বন্দিপুরে এবং কালই দাদাকে আমি ঠাকুরমার অসুখ হয়েছে এই কথা বলে বাড়ি ফিরিয়ে আনব।

বন্দিপুর যেতে হয় মদনপুর স্টেশনে নেমে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ক্রোশ দুই হেঁটেতো বিকেলে বন্দিপুর পৌঁছানো গেল। বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলুম। পাঁচুমামা বাড়িতে নেই, দাদাও নেই—শুনলাম তারা কানসোনার বাজারে গিয়েছে।

আমি পাঁচুমামার বাড়ির সামনে একটা বেলগাছতলায় বসে আছি, কে একজন মোটাসোটা কুচকুচে কালো স্ত্রীলোক সামনের ঘর দিয়ে মেটে কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল—নারাণবাবু তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই দ্যাখো, ওই বেটি সেই রাজি দুলেনী—ওরই পাদপদ্মে তোমার দাদা সব টাকা ঘুচিয়েচে।

একটু পরে দাদা ও পাঁচুমামা বাড়ি ফিরল। আমাদের দেখে দুজনেই প্রথমটা অবাক হয়ে যেন থতমত খেয়ে গেল, তারপর দাদা জিগ্যেস করলে—কিরে নগা, কি মনে করে?

নারাণবাবু বল্লেন—ও এসেছে তোমায় বাড়ি নিয়ে যেতে। তোমার ঠাকুরমার বড় অসুখ যে!

—অসুখ? কি অসুখ?

দাদা আমার মুখের দিকে চাইলে। দাদার হঠাৎ ভয়-পাওয়া হঠাৎ-ম্লান মুখের দিকে চাইতে পারলুম না। বড় কষ্ট হলো, একবার মনে হলো, সত্য কথাটা বলে ফেলি। কিন্তু তা হলে দাদা যদি বাড়ি না যায়?

সেই রাত্রেই দাদাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

বাড়ি এসে দাদা খুব বকুনি খেলে ঠাকুরমা ও মায়ের কাছে। তার উত্তরে সে নারাণবাবুকে গালমন্দ দিয়ে যা-তা বলে গেল। কে বলেছে সে সর্ষে কেনে নি? এখনও বিশ মণ সর্ষে ঘরে মজুত রয়েছে—আর সব মাল চাষাদের ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে, দরকার হলেই—রাজি দুলেনী কে? রাজি দুলেনীকে দাদা চেনেও না। নারাণবাবুর মত কুটিল, ধড়িবাজ লোক দুনিয়ায় আর নেই। তিনি টাকা ধার চেয়েছিলেন, দাদা দেয়নি, তাই তিনি দাদার বিরুদ্ধে এই সব মিথ্যে রটনা করে বেড়াচ্ছেন।

বলা বাহুল্য, মা বা ঠাকুরমা দাদার এসব কথা কিছু বিশ্বাস করলেন না। মাসখানেক পরে পাঁচুমামা আবার একদিন এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। ঠাকুরমাবল্লেন—পেঁচো শোন। হতভাগা, আমার কাছে যে একরাশ টাকা চেয়ে পাঠালি পটলকে দিয়ে ব্যবসা করবি বলে, কই ব্যবসার হিসেব দেখা তো আমায়? দেখি কোথায় গেল এতগুলো টাকা?

পাঁচুমামার মুখে চিরদিন তুবড়ি ছোটে। হাত পা নেড়ে সে বুঝিয়ে দিলে, টাকা ডোবানো তো দূরের কথা—আর মাস দুই পরে ওই চারশো টাকায় অন্তত দেড়শোটি টাকা লাভ দাঁড়াবে। তখন লাভে মূলে একসঙ্গে টাকাটা এনে দেবে এখন। পাঁচুর অদৃষ্ট খারাপ, সে যার জন্য চুরি করে—সেই নাকি পাঁচুকে চোর বলে! যাক্, তার জন্যে সে দুঃখিত নয়—আসল টাকাটা কোনো রকমে ঠাকুরমায়ের হাতে তুলে দিতে পারলেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ততদিন পর্যন্ত রাত্রে ঘুম নেই তার।

পাঁচুমামার বক্তৃতায় ঠাকুরমার বিশ্বাস ফিরে এল। ফলে পাঁচুমামা আমাদের বাড়িতে রয়েই গেল। দাদাকে এর আগেই সে নষ্ট করেছিল, এবার আমার পিছনে লাগল এবং অদ্ভুতভাবে সাফল্য অর্জন করল। এমন কি কিছুদিন পরে আমারই মনে হলো, আমি দাদাকে বুঝি ছাড়িয়েই যাই।

তখন আমার বিবাহ হয়নি—দাদার সব হয়েছে। আমি নানা ছুতোয় ঠাকুরমার কাছ থেকে টাকা আদায় করি আর পাঁচুমামার পরামর্শমত খরচ করি। মহকুমা শহর ছিল নিকটেই। নানা ছুতোনাতায় মহকুমায় গিয়ে আমি আর পাঁচুমামা প্রায়ই রাত্রে বাড়ি ফিরতুম না। ধাপে ধাপে শেষে এতদূর পর্যন্ত নেমেছিলুম।

পাঁচুমামাকে সত্যি আমি অদ্ভুতকর্মা মানুষ বলে ভাবতাম। যেমন জানে ব্যবসা, তেমনি রাখে দুনিয়ার সব খবর; যেমনি বোঝে মোকদ্দমা, তেমন পায় ফুর্তি করতে। পাঁচুমামার হাতে টাকাগুলি তুলে দিয়ে বলতাম, এর মধ্যে থেকে যা যা দরকার খরচ করো।

যত টাকাই দিই, তিন-চার দিনের মধ্যে সব খরচ করে ফেলে আবার আমার কাছে চাইতেন। বলতেন—কিনু, বুড়ির হাতে মোটা টাকা আছে। তা তোমার দ্বারা কিছু যে হবার নয়, আমি বুড়ির নাতি হলে দেখতিস!

মামার কাছে কখনও টাকার হিসেব নিইনি—অসীম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ছিল আমার পাঁচুমামার ওপরে। কিভাবে ও কোথায় যে সব টাকা ব্যয় হত, সে কথা আর বলবনা—তবে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ শো টাকা পাখির মত উড়ে গেল বেমালুম। ঠাকুরমা হাত গোটালেন, মায়ের গহনা বন্ধক পড়তে লাগল। এই অবস্থায় পাঁচুমামা একদিন তেওটা বন্দিপুরে বিশেষ কাজ আছে বলে চলে গেলেন, আর এলেন না।

মাস দশেক পরে একদিন শীতের রাত্রে মুড়িসুড়ি দিয়ে দালানে বসে আছি, এমন সময় পাঁচুমামা আমাদের বাড়ি এসে আবার হাজির।

আমায় বল্লেন—এই যে, ভাল আছিস নগা? পটলা কোথায়?

বল্লুম—দাদা ওপাড়ায় গাঙ্গুলি-বাড়ি গিয়েছে বোধ হয়। তারপরে, এতদিন কোথায় ছিলে মামা? এসো বসো—বড্ড শীত।

পাঁচুমামা দরজা ভেজিয়ে আমার কাছে এসে বসল। বলল—শোন্, একটা কথা বলতে এলুম তোদের। কাল এখানে এক ভদ্রলোক আসবে সকালের গাড়িতে। যদি তোদের কিছু জিগ্যেস করে,তবে বলবি, তোদের

এখানকার বিষয়-সম্পত্তিতে আমার পাঁচ আনা অংশ আছে। বলতে পারবি তো? পটলা কোথায় গেল—তাকেও কথাটা শিখিয়ে রাখি!

কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে বল্লুম—কি, কি ব্যাপার মামা? কে আসবে?

ব্যাপার যা শুনলুম তা সংক্ষেপে এই। পাঁচুমামার বিবাহ, কাল তাকে দেখতে আসবেন মেয়ের বাপ নিজে। আসলে তো পাঁচুমামার কিছু নেই তেওটা-বন্দিপুরে, যা ছিল তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে অনেককাল। কিছু না দেখালে মেয়ে দেবেই বা কেন? মেয়ের বাপের নাম হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে, মদনপুরের কাছেই কি গাঁয়ে বাড়ি, গরিব অবস্থার লোক। তিনটি মেয়ে তাঁর, মেয়ে তিনটি অপরূপ সুন্দরী—এইটি বড়; পাঁচুমামা এই মেয়েটিকে দেখে নাকি পাগল হয়েছেন, বিয়ে যে কোনো উপায়ে হোক হওয়াই চাই।

রাত্রে দাদা ফিরলে দাদাকে বলা হলো সব কথা। দাদা বল্লে—পাঁচ আনা অংশ কেনা আছে যদি জিগ্যেস করে?

—তবে বলবে তোমার বাপ আমার বাবার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল—সেই দেনার দায়ে সম্পত্তির অংশ বিক্রি করে যায়।

আমরা রাজি। কিন্তু ভদ্রলোক যদি গাঁয়ের আর কাউকে জিগ্যেস করেন? তবেই তো মিথ্যে কথা ফাঁস হয়ে যাবে! পাঁচুমামা সেকথাও ভেবে এসেছেন। গ্রামের যে ক'জন লোক আমাদের পয়সায় ফুর্তি করেন, যেমন হাবু সান্যাল, ও পাড়ার আশু চক্কত্তি, এঁদের বয়েস আমাদের চেয়ে বেশি—এঁদেরও কথাটা বলে রাখতে হবে। আমরা বল্লে কেউ 'না' বলতে পারবে না। কাল মেয়ের বাপের সামনে তাঁদের হাজির করতে হবে। তাঁরাও আমাদের কথায় সায় দেবেন।

পরদিন সকালে আমাদের দলের লোক যাঁরা, তাঁদের একথা বলা হলো। তাঁরা সকলেই রাজি হলেন, না হয়ে উপায় ছিল না।

দুটোর কিছু আগে মেয়ের বাপ হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে এলেন। ছেলে দেখে পছন্দ করলেন; তারপর ছেলের কি আছে না আছে সে কথা উঠল।

পাঁচুমামা বল্লে, আমাদের জমিজমার সে পাঁচ আনার মালিক। আমরা তাতে সায় দিলাম। হৃষিকেশ বাঁড়ুজ্যে নিতান্ত সরল, গ্রাম্য লোক এবং ভাবে মনে হলো নিতান্ত গরিব। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারের কিছু বোঝেন না। কেবল একবার জিগ্যেস করলেন—আপনারা তো ভাগ্নে, ভাগ্নের সম্পত্তিতে আপনাদের মামার অংশ কি করে এল?

এর উত্তরে বাক্‌পটু পাঁচুমামা একটি যে মিথ্যা কথা বানিয়ে বল্লে, আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম—আমাদেরই মনে হলো, পাঁচুমামা যা বলছে তাই বুঝি সত্যি। কবে আমার বাবা পাঁচুর বাবার কাছে টাকা ধার করেছিলেন, সুদে আসলে তা কত টাকা দাঁড়ায়, তারই বদলে আমার বাবা পাঁচুর বাবাকে পাঁচ আনা সম্পত্তির উপস্বত্ব দিয়ে যান।

যে কোনো বিষয় বুদ্ধিমান লোক হলে এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হত, কিন্তু হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যের মনে কোনো সন্দেহ জাগল না। আমাদের এখানে আহারাদি করে বৈকালের দিকে বাঁড়ুজ্যে মশায় চলে গেলেন। যাবার আগে পাত্র আশীর্বাদের দিন স্থির করেই গেলেন।

উভয় পক্ষের আশীর্বাদের পরে বিবাহের দিন স্থির হলো। নির্দিষ্ট দিনে আমরা সবাই বরযাত্রী গেলাম। বলা বাহুল্য, পাঁচুমামার চালচুলো পর্যন্ত ছিল না—জমিজমা থাকা তো দূরের কথা—সুতরাং আমাদের বাড়ি থেকেই বর বিয়ে করতে রওনা হলো এবং কথা হলো যে বউ নিয়ে আবার পাঁচুমামা আমাদের বাড়িতে ফিরে আসবে।

কনের বাপের বাড়ি একখানা মাত্র খড়ের ঘর, তারই দাওয়ায় সম্প্রদানের আসর, কারণ বর্ষাকাল, বৃষ্টি যখন তখন আসতে পারে। বরযাত্রী থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল কিছু দূরে এক প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে।

কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুবই কম, সবসুদ্ধ জন পনেরো। বাড়ির ভিতরে উঠানে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তারই তলায় আমরা বসে গেলাম। লগ্ন ছিল বেশি রাত্রে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া তার আগেই শেষ করে দেওয়া হলো।

হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যের অবস্থা কত খারাপ তা বোঝা গেল একটু পরেই। তিনি নগদ বরপণ স্বরূপ একুশটি মাত্র টাকা দিতে চেয়েছিলেন, এখন বিবাহসভায় দেখা গেল তিনি মাত্র এগারোটি টাকা থালার উপর সাজিয়ে রেখেছেন। বরকর্তা ছিলেন আমাদের গ্রামের দাশু চক্রবর্তী, প্রবীণ লোক বলে তাঁকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছি কর্তা সাজিয়ে, নইলে পাঁচুমামার তরফ থেকে বরকর্তা হবার কোনো মানুষ নেই তো!

দাশু চক্রবর্তী আমাদের উপদেশমত বল্লেন—একুশ টাকার কথা ছিল, এগারো টাকা কেন? বাকি টাকা না দিলে বর সভাস্থ করবার অনুমতি দেব না।

হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে হাত জোড় করে বল্লেন—আর জোগাড় করতে পারিনি, ওই নিয়ে আমায় মাপ করতে হচ্ছে বেহাই মশায়। আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর কি বলব, ঘরের চালে দেবার জন্যে খড় কিনে রেখেছিলাম—সেই খড় বেচে দিয়ে তবেওই এগারো টাকা জোগাড় করেছি! সামনে বর্ষা আসছে, ঘরের মধ্যে এসে দেখুন চালফুটো—আলো আসছে। ঘর সারাবার আর কোনো সঞ্চয় নেই। আর টাকা হলেও এই জষ্টি মাসে খড় পাব কোথায়?

এর পরে আমরা তর্ক চালাতাম, ছাড়তাম না। তোমারচালে খড় নেই তা আমাদের কিরে বাপু? মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছ, আগে থেকে তোড়জোড় করনিকেন? রইল তোমার বিয়ে-থাওয়া—আমরা বর সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব!

এসব কথা বলা চলতো, কিন্তু পাঁচুমামা দেখি ছঠ্ফঠ্ করছে—তার ইচ্ছে নয় টাকার জন্যে আমরা বিয়ে ভেঙে দিই বা কোনো বাধা সৃষ্টি করি। সে আমায় ডেকে কানে কানে বল্লে, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে! তার চোখমুখের করুণ ভাব দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে। কেবল ভাবছে, তার বিয়েটা বুঝি আমরা পাঁচজনে মিলে ভেস্তে দিলাম। যাই হোক, পাঁচুমামার অবস্থা দেখে আমরা আর বেশিদূর ব্যাপার গড়াতে দিলাম না; বর সভাস্থ করা হলো। মেয়েকে যখন আনা হলো, মেয়ের রূপ দেখে আমরা তোঅবাক। এমন রূপসী মেয়ের সঙ্গে পাঁচুমামার বিয়ে হচ্ছে তা তো জানতাম না! কি গায়ের রং—কি সুন্দর গড়নপিটন, আর তেমনি মুখশ্রী। অমন রূপের ডালি মেয়ে কালেভদ্রে চোখে পড়ে। তাই পাঁচুমামা ক্ষেপে উঠেছে এই বিয়ের জন্যে—তাই এত জুয়োচুরি, এত আটঘাট বাঁধা, এত দুর্ভাবনা—পাছে এমন মেয়ে হাতছাড়া হয়ে যায়!

মনে মনে ভাবলাম—পাঁচুমামার অদৃষ্টটা দেখছি বেজায় ভাল। নইলে এমন মেয়ে ওর জোটে! ওর চাল নেই, চুলো নেই, তিনকুলে কেউ নেই—অজমূর্খ, গাঁজা খায়, নেশাভাঙ করে, কোন্ বদমাইশিটা ওর বাকি আছে জিগ্যেস করি! আমার দাদাকে আর আমাকে তো ও-ই নষ্ট করেছে। তার ওপর পাঁচুমামা ঘোর জুয়াচোর আর ঘোর মিথ্যাবাদী। লোককে ঠকাতে এমন ওস্তাদ আর দুটি নেই। এই বিয়েই তো করছে জুয়োচুরি করে। আমাদের বিষয়ে ওর পাঁচ আনা অংশ আছে না ছাই আছে! সত্যি কথা জানলে বিয়ে দিত মেয়ের বাপ? বিশেষ করে যখন এমন সুন্দরী মেয়ে!

যাক্, সে সব কথায় দরকার কি আমাদের। বিয়ে-থাওয়া মিটে গেল, বর-কনে আমাদের বাড়ি এসে উঠল। বৌভাত কিন্তু আমাদের বাড়িতে হবে না একথা ছিল আগে থেকেই। কারণ আমাদের এখানে বৌভাত করতে গেলে আমাদের নামডাকের উপযুক্ত জাঁকজমকের সঙ্গে বৌভাত করতে হয়—নইলে আমাদের নিন্দে হবে। সে খরচ দেয় কে, কাজেই ঠাকুরমা বলেছিলেন—বৌ এখানে তুলে তারপর তুমি পৈতৃক ভিটেতে নিয়ে যেয়ো। সেখানে কাজকর্ম কোরো গিয়ে। এখানে ওসব হবে না।

পাঁচুমামা বৌ নিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল।

আমার মা ছিলেন বড় খাঁটি লোক। তিনি জানতেন না যে পাঁচুমামা বিয়ের আগে কি জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েছিল, আমাদের বিষয়ে তার পাঁচ আনা অংশ থাকা নিয়ে।

মা বল্লেন—পাঁচুর বৌটি যেন হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা,—কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্ট ভাল নয়। আমার জ্ঞাতি ভাই হলেও আমি বলছি—ওরকম পাত্রে অমন রূপের ডালি মেয়ে কি দেখে যে বুড়ো দিল, তা সেই জানে। ওই বাঁদরের গলায় ওই মুক্তোর মালা!

মা জানতেন না এর মধ্যে আসল কথাটা কি। পাত্রীর বাবার কোনো দোষ ছিল না, যত সব জুয়োচোরের পাল্লায় পড়ে সরল বৃদ্ধ তাঁর সুন্দরী মেয়েটিকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছেন। সে জল যে কত গভীর জল, প্রথম থেকেই তা বুঝতে নববধূ বা তার বাপ, কারও বাকি রইল না। পাঁচুমামা বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়ি বন্দিপুরে চলেগেল বটে—কিন্তু বৌভাত হলো না সেখানে। পয়সা কোথায় পাঁচুমামার যে বৌভাত হবে?

বন্দিপুর বড় কখনও যেতাম না—এখান থেকে পাঁচুমামা চলে যাওয়ার পরে আমার সঙ্গে আর অনেক দিন ওদের দেখা হলো না—বিয়ে করার পরে এখানে আসাটা যেন পাঁচুমামার কমে গেল। দাদা মাঝে মাঝে যেত বন্দিপুরে—এসে গল্প করত, পাঁচুমামার সংসার অতি কষ্টে চলছে। নতুন বৌয়ের গায়ে এক আধখানা গহনা যা তার বাবা দিয়েছিলেন, এরই মধ্যে পাঁচুমামা বেচে ফেলেছে। বৌটি কিন্তু খুব ভাল, সে ইচ্ছে করে গহনা খুলে দিয়েছে—ইত্যাদি।

বছর তিন-চার কাটল। তারপর একদিন খবর এল পাঁচুমামা মারা গিয়েছে। আগে থেকে নেশা-ভাঙ্ খায়, লিভার ছিল খারাপ, নেফ্রাইটিস্ হয়ে মারা পড়েছে, চিকিৎসাপত্র বিশেষ কিছু হয়নি।

দিন পনেরো পরে একদিন সকালে আমি বাইরের উঠানে একগাছা ছিপ চাঁচতে বসেছি—দাদা বাড়ি নেই, কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরমা নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছেন— এমন সময় আমাদের বাড়ির সামনে একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নামলেন হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে এবং তাঁর বিধবা মেয়ে।

আমি ছুটে কাছে এলুম—পাঁচুমামার বিধবা স্ত্রীকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম, বাঁড়ুজ্যে মশায়কেও করলুম। রূপসী বটে এই বিধবা মেয়েটি। মেয়ে নাঅগ্নিশিখা! বিয়ের সময়েও তো এতটা রূপ দেখিনি মামিমার। আমি মামিমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে মার কাছে রেখে হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যের কাছে এসে বসলাম।

তিনি বল্লেন—যা হবার তো হয়ে গিয়েছে, তার আর চারা নেই। মেয়েটার এই সবে উনিশ বছর বয়েস—ওর মুখের দিকে তো চাইতে পারা যায় না। এখন এমন অবস্থা যে দিন চলে না, পাঁচু একটি পয়সা রেখে যায়নি যে মেয়েটা একদিন সেখানে হাঁড়ি চড়িয়ে খায়। ধার দেনা করে কোনো রকমে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ সেরে শুদ্ধ করিয়েছি দাদা। ভাবলাম, আগে তো মেয়েটাকে শুদ্ধ করি, তারপর পাঁচুর বিষয়ের যে অংশ আছে এখানে, তা থেকে দেনা শোধের কথা ভাবা যাবে পরে। তাই আজ এলাম মেয়েটাকে নিয়ে। ওরও তো ঘোর দুরবস্থা। বন্দিপুরে একবেলা খায় এমন অবস্থা নেই। পরনে কাপড় ছিল না, দেনা করে একখানা সরুপাড় কাপড় কিনে দিয়েছিলাম শ্রাদ্ধের পরে, তাই পরে এসেছে। আমার তো অবস্থা সবই জানো—এখনও দুই মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি, এক পাল কুপুষ্যি—তাদেরই খেতে দিতে পারিনে, তা আবার বিধবা মেয়ে নিয়ে গিয়ে রাখি বা কোথায়, খেতে বা দিই কি? এখন বিষয়ের পাঁচুর যা অংশ এখানে আছে—তা থেকে মেয়েটার একটা হিল্লে তো হোক। দেনাটা শোধ করে দিয়ে না হয় তার উপস্বত্ব থেকে এখানেই একখানা খড়ের ঘর তুলে দিই ওকে! ও তো মেয়েমানুষ, কিছু বোঝে না—আমি সঙ্গে করে আনলাম। মেয়েও বল্লে—বাবা, চলো সেখানে—তুমি দাঁড়িয়ে থেকে আমার একটা ব্যবস্থা করে রেখে এসো। আর তাঁরাও ভাল—লোক— তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়ের অংশের যা আয় দাঁড়ায়—তা থেকে আমার একটা বিলিব্যবস্থা—আর বন্দিপুরে থেকেই বা কি হবে, সেখানে তো

এক ভাঙা খড়ের ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই—যখন বিষয় এখানে, সম্পত্তি এখানে, তখন এখানেই যা হয় একটা ঘরদোর বেঁধে—

আমি এই লম্বা বক্তৃতায় বাধা দিয়ে একটু আশ্চর্য হবার সুরে বল্লুম, কিসের বিষয়? কিসের অংশের কথা বলছেন—?

হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে বল্লেন—ওই যে পাঁচুর যে অংশ আছে এখানকার বিষয়ে, তা তো ধরো এখন আমার মেয়েরই অর্শেছে। তোমাদের এত বড় বিষয়ের পাঁচ আনা অংশ কি কম? ওর এক বেলা একমুঠো আলোচালের ভাত আর বছরে চারখানা কাপড় তা থেকে হেসে খেলে চলে যাবে—

আমি বিনীত শান্ত হাসিমুখে ভদ্রতার সুরে বল্লাম—আপনি ভুল করছেন বাঁড়ুজ্যে মশায়, এখানকার বিষয়ে পাঁচুমামার কোনো অংশ নেই।

অ্যাঁ! সে কি কথা?

হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে প্রথমটা তো হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরক্ষণেই কি ভেবে সামলে নিয়ে চিৎকারের সুরে বল্লেন—অংশ নেই কেমন কথা? বিয়ের আগে তো তোমরাই বলেছিলে পাঁচ আনা অংশ আছে—বলো নি? আর এখন বলছ নেই? আমার মেয়েকে ছেলেমানুষ পেয়ে এখন ফাঁকি দেওয়ার মতলব? বরাবর শুনে আসছি অংশ আছে, আর এখন অংশ নেই বল্লেই হলো?

আমারও রাগ চড়ে গেল মাথায়। আমি বল্লুম—আপনি মিছে চেঁচামেচি করেন কেন? আপনি বিষয়সম্পত্তির কিছুই বোঝেন না তাই ওকথা বলছেন। এ তো শোনাশুনির কথা নয়। দলিল দস্তাবেজের কথা, পড়চা কোবালার কথা। বিষয়সম্পত্তি গাছের ফল নয় যে—যে কুড়িয়ে পায় সেই খায়। আমার বাবা যদু চক্কতির নামে সাতখানা গাঁয়ের প্রজা কাঁপত—তিনি কি দুঃখে তেওটা বন্দিপুরের পাঁচু রায়ের বাবার কাছে বিষয়ের পাঁচআনা বেচতে যাবেন?ও সব ভুলে যান। যা শুনেছেন, ভুল শুনেছেন। বিশ্বাস না হয় আমার কথা, রেজিস্ট্রি আপিসে দুটাকা ফি জমা দিয়ে খুঁজে দেখুন গিয়ে সেখানে এমন কোনো দলিল আছে কিনা? আমরা দলিল গোপন করতে পারি, সেখানে তো গোপন থাকবে না?

চেঁচামেচি শুনে পাড়ার দু-পাঁচজন জড় হলো। তারাও হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যের সরলতা দেখে কোনোক্রমে হাসি চেপে রইল। যারা সেবার সাক্ষী দিতে এসেছিল যে পাচুমামার বিষয়ের অংশ আছে, তারাই বলে গেল পাচুর এখানকার বিষয়ের অংশ আছে এমন কথা কস্মিন্‌কালে তারা শোনেওনি।

সব শুনে হৃষীকেশের বিশ্বাস হলো শেষ পর্যন্ত যে এদের কথাই সত্যি।

তিনি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—তারপরেই হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, ডুক্‌রে মেয়েমানুষের মত কেঁদে উঠলেন—আমি মেয়েটির সর্বনাশ করেছি নিজেরহাতে—তখন কি জানি এমন জুয়োচুরি আমার সঙ্গে সবাই করবে—আমার অমন সোনার পিরতিমে মেয়েটা—আমায় ভালমানুষ পেয়ে—

ভাল হাঙ্গামাতেই পড়া গেল দেখছি সকালবেলা!

বুড়োর কান্না শুনে পাড়ার লোক জড় তো হলোই, বাড়ির মধ্যে থেকে মা, ঠাকুরমা ছুটে এলেন, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রী পর্যন্ত সেই সঙ্গে ছুটে এলেন দেখতে যে তার বাবাকে বুঝি আমি মারধর করেছি।

সে এক কাণ্ড আর কি!...

ঠাকুরমা তো বুড়োকে অনেক অনুরোধ করে তাঁর কান্না থামিয়ে তাঁকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। অনেক কি সব বোঝালেন-সোঝালেন। আমায় ডেকে খুব বকুনি দিলেন; আমি নাকি লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানি নে।

আমি বল্লাম—এর আর কথা কইতে জানাজানি কি, আমি যা সত্যি কথা তাই বলেছি। তুমিই বলো না কেন, আমাদের বিষয়ে পাঁচুমামার কি পাঁচ আনা অংশ ছিল?

মা শুনে অবাক, তিনি এসব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। বল্লেন—সে কি কথা! পাঁচুর এদের বিষয়ে অংশ কেন থাকবে? এ কি রকম কথা, এ তো বুঝতে পারছি নে?

ক্রমে তিনি সব শুনলেন। আমার ও দাদার ওপর খুব রাগ করলেন শুনে। বল্লেন—বেশ, আমার ছেলেরা যখন এজুয়োচুরির মধ্যে আছে, তখন আমি পাঁচুর বৌয়ের ভরণ-পোষণের ভার নিলুম। মেয়েকে এ বাড়িতে রেখে চলে যান। আজ থেকে ও আমাদের ঘরের লোক।

হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে বল্লেন—জিগ্যেস করে দেখুন আপনার ছেলেকে? ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে, বিয়ের আগে পাত্র আশীর্বাদের দিন একথা বলেছিল কিনা! আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদের দেখে। আমি তো পাঁচুকে দেখে দিই নি। ভাবলাম আপনাদের আত্মীয়, আপনাদের বিষয়ের অংশীদার—তাই আমি সম্বন্ধ করি। তখন কি করে জানব এর মধ্যে এত জুয়োচুরি!

আমি বল্লাম—এ কথা আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বলছেন। যদি কেউ বলৈ মণীন্দ্র নন্দীর জমিদারিতে আমার অংশ আছে—অমনি তার অংশ হয়ে যাবে?

ঠাকুরমা আমায় আবার ধমক দিয়ে চুপ করালেন। হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যেকে স্নান করতে পাঠালেন, তারপর খাইয়ে-দাইয়ে তাকে সস্থ করলেন। যাবার সময়ে হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে ঠাকুরমার হাতে ধরে বল্লেন—আমার মেয়েকে আপনি রেখে দিন। আমার সংসারে একপাল পুষ্যি, খেতে দিতে পারি নে। আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্বত, আমার মেয়েকে একবেলা একমুঠা আলোচালের ভাত—

মা ও ঠাকুরমা বল্লেন—তার আর কি, বৌমা থাকুন এইখানেই। পাঁচুর বৌ আমাদের তো আর পর নয়, কপালই না হয় পুড়েছে সকাল সকাল।

সেই থেকে পাঁচুমামার স্ত্রী আমাদের সংসারে রয়ে গেলেন। প্রথমে ছিলেন বেশ সুখেই, যতদিন মা ঠাকুরমা বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁরা একে একে গেলেন স্বর্গে। দাদারবিয়ে আগেই হয়েছিল, আমারও বিয়ে হলো। হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে ওদিকে মারা গেলেন। পাঁচুমামার স্ত্রীরও আর বাপের বাড়ি যাবার জায়গা রইল না।

নতুন বৌয়ের দল নিজের সুবিধামত সংসার সাজিয়ে নিয়েছিল। পাঁচুমামার স্ত্রীর এ-সংসারে থাকাটা তারা গোড়া থেকেই অনধিকার-প্রবেশ বলে ধরেছিল, এইবার সামান্য পান থেকে চুন খসলেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে অপমান করা শুরু করলে। এর আর একটা কারণ ছিল। পাঁচুমামার স্ত্রী ছিলেন অসামান্যা রূপবতী বিধবা মানুষ, একবেলা খেতেন, একখানা নরুনপাড় কাপড় পরতেন—তাতেই তাঁর রূপ ধরতো না। বয়সের সঙ্গে সে রূপ ম্লান হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন বাড়তেই লাগল।

নতুন বৌয়েরা দেখতে অমন সুন্দরী নয় কেউ-ই। তাদের মনে পাঁচুমামার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে নানা হিংসে, ঘোর সন্দেহ এসে জুটতে লাগল।

পাঁচুমামার স্ত্রী তো এ বাড়িতে থাকতেন বিনি মাইনের রাঁধুনী ঝি চাকরানির মত। কিন্তু তাঁর ওপর অত্যাচার অবিচার তাতেও কম ছিল না।

আমার সত্যিই কষ্ট হত পাঁচুমামার স্ত্রীর জন্যে। যে সহানুভূতি পাঁচুমামার ওপর কখনও হয় নি, পাঁচুমামার শ্বশুরের ওপর হয় নি—তা হয়েছিল এই অসহায় বিধবা নারীর ওপর।

কিন্তু আমার কথা কওয়ার কোনো উপায় ছিল না, তাহলেই আমার স্ত্রী সন্দেহ করবেন, কেন আমি পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষে এত কথা বলছি। আমার পূর্বেকার রেকর্ড খুব ভাল ছিল না, সুতরাং স্ত্রী পদে পদে আমায় সন্দেহ করতেন, আমিও যে না বুঝতাম এমন নয়। সুতরাং পারিবারিক শান্তিভঙ্গের ভয়ে মুখ বুজেই থাকতাম।

এত সাবধান থেকেও একবার বড় বিপদে পড়ে গেলাম। সে দিনটা একাদশী। দেখি বেলা এগারটার সময়ে পাঁচুমামার স্ত্রী একরাশ বাসন মেজে ডোবা থেকে উঠে আসছেন। আমি বড় বৌ অর্থাৎ আমার বৌদিদিকে বল্লাম—বৌদিদি, মামিমাকে আজ বাসন মাজতে দিয়েছে কে? আজ একাদশীর দিনটা, তোমরা একটু দেখো শোনো না সংসারের কাজের কি হয় না হয়?

বৌদিদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্লেন—ও সব লোক দেখানো ঢং! কে বললে বাসন মাজতে? অন্যদিন বল্লেও তো কাজ করতে দেখিনে—আর আজ বাসন না মেজে আনলে দরদ কুড়ানো যাবে কি করে? ওসব কি আর বুঝি নে, তা বুঝি।

বৌদিদি কি বোঝেন জানি নে, কিন্তু সেদিন রাত্রে আমার স্ত্রী আমায় বল্লে—ওগো শোন, একটা কথা বলি। কথা রাখবে বলো?

—কি কথা বলো?

—তুমি ওকে বাড়িতে রাখতে পারবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বল্লাম—কাকে গো? ভেঙেই বলো না?

—ওই যে তোমাদের মামিমাকে। ওকে এখুনি তাড়াও।

—কেন, মামিমা কি করছেন?

—সোজা কথা বলি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে। ও তো তোমাদের আপন মামিমা নয়—বিশেষ কোনোসম্পর্কও কিছু না। সামান্য পাতানো সম্পর্ক। আর ওই রূপ, আর ওই বয়েস! তোমাকে আমি চিনি—মিছে অশান্তি কেন সৃষ্টি করবে? সরাও ওকে এখান থেকে। আমি গতিক ভাল দেখছি নে।

বুঝলাম, সেই যে দুপুরবেলা পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষ হয়ে একটা কথা বলেছিলাম বড় বৌয়ের কাছে, তিনিই লাগিয়েছেন সমস্ত কথা ছোট বৌকে। কি বিশ্রী মন এই সব পাড়াগাঁয়ের মেয়েমানুষদের! অস্বীকার করি নে যে আমার রেকর্ড ভাল না, আমিই জানি আমি কি বা আমি কি নই। কিন্তু একজন আশ্রিতা অসহায়া তরুণী বিধবা, যার প্রতি সত্যিই আমার সহানুভূতি ও অনুকম্পা, যাঁকে মামিমা বলে ডাকি—তাঁর সম্বন্ধে এই সব—

আমার মন একমুহূর্তে বিরূপ হয়ে উঠলো সংসারের ওপর, স্ত্রীর ওপর, বৌদিদির ওপর, সমস্ত ব্যাপারটার ওপর, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রীর ওপরও।

বল্লাম—বেশ ভাল, আজই যেতে বলছি।

মনে ভাবলাম, এমন করে বলবো যে স্ত্রী পর্যন্ত দুঃখিত ও অপ্রতিভ হয়ে উঠবে।

পরদিন সকালেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে ডেকে বললাম—আপনার আর এখানে থাকা হবে না। আপনাকে নিয়ে সংসারে অশান্তি বাধছে, আপনি এখুনি আমাদের বাড়ি থেকে অন্যত্র যান।

বড় বৌ বল্লেন—সে কি কথা! কাল গিয়েছে একাদশী, আজ দ্বাদশীর দিন। না খেয়ে কোথায় যাবেন উনি? কাল দিনরাত নিরম্বু উপোস গিয়েছে, সংসারের অকল্যেণ হবে যে।

মনে মনে ভাবলাম—সেইটেই বোঝ। আর একটা গরিব অসহায়া মেয়ের যে কি হবে তা মনেও ওঠে না। তোমাদের ভাল করেই কল্যাণ করাচ্ছি।

পাঁচুমামার বৌ কথাটি বল্লেন না। নিজের পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আমি জানি তাঁর কোথাও যাবার জায়গা নেই—বাপের বাড়ি এক গাঁজাখোর বেকার ছোট ভাই আছে, সেখানে একমুঠো খাওয়াও জুটবে না এক বেলা। কিন্তু সব জেনেও বড় রূঢ় ও কঠিন হয়ে উঠলাম আজ। একাদশীর পরদিন না খেতে দিয়েই তাড়াবো! করাচ্ছি সংসারের কল্যাণ তোমাদের!

সেই সকালেই চা খেয়ে বসে আছি, পাঁচুমামার বৌ দুটি পান সেজে ডিবের বাটিতে আমার সামনে রেখে দিয়ে পুঁটলি বগলে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি মুখে কিছু বলিনি, কেবল স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে যাবার জন্যে আমাদের মুহুরী বৃদ্ধ গোপাল মিত্রকে পাঠিয়ে দিলাম এবং আপদ চুকে গেল ভেবে আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। পাঁচুমামার বৌয়ের তারপর থেকে আর কোনো খবর রাখিনি।